ইউনিট

১৯

সংবিধান

ভূমিকা

প্রত্যেক সরকারই কতকগুলো বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এসব বিধি-বিধানকে সমষ্টিগতভাবে সংবিধান বলা হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে প্রকৃতিরই হোক না কেন, সংবিধান ছাড়া কোন রাজনৈতিক ব্যবস্থাই চলতে পারে না। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি হচ্ছে সংবিধান। সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগ, ক্ষমতা বন্টনের নীতি, রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সম্বন্ধ, শাসন পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তাই সংবিধানকে রাষ্ট্রের প্রতিচ্ছবি বলা যায়। অন্যকথায়, সংবিধানকে রাষ্ট্রের মৌলিক দলিলও বলা হয়ে থাকে। কারণ সংবিধান রাষ্ট্রে যেমন আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে, তেমনি নাগরিকদের সকল অধিকার সংরক্ষণ করে এবং জনগণের সাথে সরকারের সম্পর্ক কি তা স্থির করে। প্রতিটি রাষ্ট্রের মূল ও অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হচ্ছে সংবিধান। সুতরাং প্রতিটি আধুনিক রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান অপরিহার্য। পৌরনীতিরও অন্যতম আলোচ্য বিষয় সংবিধান। এই ইউনিটে সংবিধান কি, সংবিধানের উৎসসমূহ, সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিসমূহ, সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ, সাংবিধানিক সরকার, উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশ সংবিধানের সমস্যা ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ : সংবিধান– সংজ্ঞা, উৎস, প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংবিধানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সংবিধানের উৎসসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯.১.১ সংবিধানের সংজ্ঞা

সংবিধান বলতে কোন সংগঠন পরিচালনার নিয়ম-কানুন বা বিধি-ব্যবস্থাকে বুঝায়। কোন সমিতি যেমন কতগুলো নিয়ম-বিধি দ্বারা পরিচালিত হয়, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য কতগুলো নিয়ম-কানুন ও বিধি রয়েছে। রাষ্ট্র পরিচালনার এ সকল নিয়ম ও বিধি-ব্যবস্থার সমষ্টি হল সংবিধান। রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য উপাদান হচ্ছে সরকার । সেই সরকার কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত হবে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে নির্ধারিত হবে, রাষ্ট্রের সংবিধানে সেসব বিষয়ের উল্লেখ থাকে।

সংবিধানের সংজ্ঞা ঃ প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে সংবিধানের বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। যেমন–

এরিষ্টটলের মতে, "রাষ্ট্র কর্তৃক পছন্দকৃত জীবন ব্যবস্থাই হল সংবিধান।" (The way of life the state has chosen for itself.)

কে, সি হুইয়ারের ভাষায়, "যে উদ্দেশ্য এবং যে সমস্ত বিভাগ দ্বারা সরকারের শাসন ক্ষমতা পরিচালিত হয়, সেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার নিয়মাবলীকে সংবিধান বলে।"

সি.এফ.স্ট্রং বলেন, "সংবিধান হল ঐ সকল নিয়ম-বিধির সমষ্টি যা দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, শাসিতের অধিকার এবং এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়।"

সংবিধানের সবচেয়ে আধুনিক সংজ্ঞা প্রদান করেছেন অধ্যাপক হারমন ফাইনার। তার মতে "মৌলিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুষম সম্পর্কের ব্যবস্থাই সংবিধান।" ফাইনার আরও বলেন, "ক্ষমতা সম্পর্কের আন্তরিত হল সংবিধান।"

১৯.১.২ সংবিধানের উৎসসমূহ

সংবিধানের উৎসগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–
(১) আইনমূলক ও
(২) প্রথামূলক।

নিচে এই দুই ধরনের উৎসের বর্ণনা দেওয়া হল :

(১) আইনমূলক– আইনমূলক উৎসগুলোর মধ্যে চুক্তি ও সাধারণ বিধি, পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন ও বিচারকের সিদ্ধান্ত উল্লেখযোগ্য।

(ক) চুক্তি ও সাধারণ বিধি– চুক্তি ও সাধারণ বিধি, পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইন অনেক ক্ষেত্রে সংবিধানের উৎস বলে পরিগণিত হয়। সরকারের ক্ষমতা ও কার্য পরিচালনার ব্যাপারে সময় সময় পার্লামেন্ট কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করা হয়। ভোটাধিকার, নির্বাচন পদ্ধতি, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী, ব্যক্তিগত অধিকার ইত্যাদি নির্ধারণের জন্য পার্লামেন্ট এই আইনগুলো প্রণয়ন করে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটেনের সংস্কারমূলক আইনগুলো এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

(খ) বিচারক প্রণীত আইন– বিচারক কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমেও সংবিধান তৈরি হয়েছে। প্রচলিত বিধি, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ও রাজ সনদের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিচার বিভাগ অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তা অনেকাংশে সংবিধানকে প্রভাবান্বিত করেছে। মোট কথা যখনই সরকারের সাথে জনসাধারণের কোন বিরোধ উপস্থিত হয়েছে সেই বিরোধের মীমাংসা করতে গিয়ে বিচার বিভাগ যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সেগুলো সংবিধানের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বৃটেনের ব্যক্তি অধিকারগুলো তারই ফল। সুতরাং দেখা যায় বিচারক কর্তৃক প্রণীত আইনের মাধ্যমেও সংবিধান তৈরি হয়েছে।

(২) প্রথামূলক– প্রথামূলক উৎসের মধ্যে রয়েছে চিরাচরিত রীতিনীতি ও প্রথাসমূহ। এই উৎসগুলো সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল :

(ক) চিরাচরিত রীতিনীতি– চিরাচরিত রীতিনীতি সংবিধানের একটি বড় উৎস। চিরাচরিত রীতিনীতি, সাধারণ আইন, স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশ অনুযায়ী স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠেছে। এ সমস্ত বিধি পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত অথচ এই বিধিগুলো শাসন ব্যবস্থার সর্বত্র গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সমবেত হবার স্বাধীনতা, জুরির বিচার, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা বিধানের আইনসমূহ এই সাধারণ আইন হতে উৎপন্ন হয়েছে।

(খ) প্রথা– প্রথা আইন নয়, কিন্তু আইনের মত মান্য করা হয়। রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রথা, অভ্যাস, আচার-আচরণ, দেশাচার ও প্রচলিত রীতিসমূহকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে ডাইসি প্রথা বলে আখ্যায়িত করেছেন। যদিও বিচারের ক্ষেত্রে এসব প্রথা প্রয়োগ করা হয় না, তথাপি বৃটেনের শাসন পদ্ধতি সম্বন্ধীয় অনেক অংশই প্রথার উপর নির্ভরশীল। যদিও প্রথা আইন নয় তথাপি এটি আইনের মতই

প্রতিপালিত হয়। যেমন, বৃটেনের রাজা মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ মত কাজ করেন, বছরে একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন বসতে হবে, মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকবে– এ সকল নিয়ম প্রথা মাত্র।

১৯.১.৩ সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিসমূহ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এগুলো বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অধ্যাপক গেটেলের মতে, আধুনিক রাষ্ট্রে চারটি প্রধান পদ্ধতির মাধ্যমে সংবিধান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এগুলো হচ্ছে :

(১) অনুমোদন,
(২) গণপরিষদ কর্তৃক রচিত,
(৩) ক্রমবিবর্তন ও
(৪) বিপ্লব।

এই চারটি পদ্ধতি নিয়ে নিচে আলোচনা করা হল:

(১) অনুমোদন– রাষ্ট্র উৎপত্তির বিকাশ ধারার প্রথমাবস্থায় অধিকাংশ রাষ্ট্রেই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। শাসক ছিলেন স্বেচ্ছাচারী এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ তখনও বিকশিত হয়নি। কিন্তু সময়ের বিবর্তনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ শুরু হলে জনগণের মধ্যে মৌলিক অধিকারের ধারণা জন্মে। এমতাবস্থায় বিপ্লবের ভয়ে রাজা বা শাসক একটি বিধি বা দলিলের মাধ্যমে জনগণের নিকট শাসন ক্ষমতা প্রদান করার অঙ্গীকার করেন। রাজা কর্তৃক সম্পাদিত এসব চুক্তির শর্তাবলীকে সংবিধান বলে মনে করা হয়। রাজা চুক্তির বিধি-বিধানসমূহ নিজে ইচ্ছাকৃত ভাবে পরিবর্তন করতেন না। এ ধরনের চুক্তিই রাজার পরিধি অনেকাংশে সীমিত করে। এভাবে ১৭৯৯ সনে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়ন, ১৯০৫ সনে রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় জার নিকোলাস, ১৮৪৯ সনে অষ্ট্রিয়ার রাজা ফ্রান্সিস জোসেফ এবং জাপানের সম্রাট নিজ নিজ দেশের সংবিধান ঘোষণা করেন। আর এটিই হলো অনুমোদনের মাধ্যমে সংবিধান প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পদ্ধতি।

(২) গণপরিষদ কর্তৃক রচিত– আধুনিক রাষ্ট্রে সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি বিশেষভাবে প্রচলিত। সাধারণত সংবিধান প্রণয়নের জন্য জনগণের ভোটে দেশে একটি গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদের সদস্যগণ খসড়া সংবিধান তৈরি করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে গণপরিষদ কর্তৃক তা অনুমোদিত হলে চূড়ান্তভাবে সংবিধান গৃহীত হয়। কখনও কখনও গণপরিষদে গৃহীত সংবিধানকে অনুমোদনের জন্য গণভোটে পাঠানো হয়। আমেরিকা ও বাংলাদেশের সংবিধান এ পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

(৩) ক্রমবিবর্তন– ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমেও সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণা বিকাশের সাথে সাথে স্বেচ্ছাচারী শাসকদের ক্ষমতা জনপ্রতিনিধিদের হাতে চলে আসে। দীর্ঘদিন ধরে সমাজে প্রচলিত বিধি-বিধান ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার কর্তৃক বৈধতা লাভ করে। এ ধরনের সংবিধান তৈরি করা হয় না, এটি নিজেই বিকশিত হয়। এই সংবিধান ক্রমবিবর্তনের ফল। বৃটেনের সংবিধান এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

(৪) বিপ্লব– পৃথিবীর অনেক দেশেই বিপ্লবের মাধ্যমে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপ্লব তখনই ঘটে যখন সরকারের অত্যাচার ও উৎপীড়নে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যখন এ ধরনের সরকারের উৎখাত সম্ভব হয় না, তখনই জনগণ বিপ্লবের পথ ধরে সরকারকে উচ্ছেদ করে। বিপ্লব উত্তরকালে বিপ্লবী পরিষদই নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। আবার কখনও কখনও সংবিধান কমিশনের উপর শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেসব ক্ষেত্রে জনগণের অনুমোদনের জন্য গণভোটের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। ১৯১৭ সনে রাশিয়াতে এবং বর্তমানকালে স্পেনে উক্ত পদ্ধতিতে সংবিধান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সার-সংক্ষেপ

শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সমাজে জীবন যাপন করতে হলে দৈনন্দিন জীবনে যেমন কতকগুলো বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়, তেমনি রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ ও শাসন ব্যবস্থাকে সুসংহত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য কতিপয় বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন অনুসরণ করতে হয়। এই বিধি-নিষেধগুলো না থাকলে রাষ্ট্রে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই এসব বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য। আর এটাই হচ্ছে রাষ্ট্রের সংবিধান। প্রতিটি রাষ্ট্রেই সংবিধানের কিছু উৎস ও সংবিধান প্রতিষ্ঠার কিছু পদ্ধতি রয়েছে যাকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্র সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। রাষ্ট্রের পছন্দকৃত জীবন ব্যবস্থার নাম কি?
- ক. সরকার
- খ. সার্বভৌমত্ব
- গ. সংগঠন
- ঘ. সংবিধান

২। সংবিধানের সবচেয়ে আধুনিক সংজ্ঞা কে প্রদান করেছেন?
- ক. এরিষ্টটল
- খ. গার্নার
- গ. সি. এফ স্ট্রং
- ঘ. হারমন ফাইনার

৩। সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কয়টি ?
- ক. তিনটি
- খ. চারটি
- গ. পাঁচটি
- ঘ. ছয়টি

পাঠ ২ : সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ কিভাবে করা হয় তা জানতে পারবেন।
- লিখিত ও অলিখিত সংবিধান কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের দোষ-গুণ ও পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের পার্থক্য বলতে পারবেন।
- সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাবলি ও ত্রুটিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাবলী ও ত্রুটিসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

১৯.২.১ সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ

সংবিধানকে মোট চার ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– (১) লিখিত, (২) অলিখিত, (৩) সুপরিবর্তনীয় এবং (৪) দুস্পরিবর্তনীয়।

(১) লিখিত সংবিধান– যে সংবিধান এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলা হয়।

গেটেলের ভাষায় "যখন কোন দলিলে সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থার সকল মৌলিক নীতিগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে তখন তাকে লিখিত সংবিধান বলে।" বাংলাদেশ, ভারত, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত। লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ অংশ লিখিত।

(২) অলিখিত সংবিধান– অলিখিত সংবিধান কোন নির্দিষ্ট দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের শাসন সম্পর্কিত বিষয়াদি প্রচলিত প্রথা, রীতিনীতি, দেশাচার এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে অলিখিত সংবিধানের কিছু অংশ লিখিত থাকতে পারে।

অধ্যাপক ফাইনারের মতে, "যেখানে আইন প্রণেতাগণ সংবিধানকে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন নি এবং এর ফলে সাংবিধানিক আইনকে অন্য প্রকার আইন থেকে পৃথক করা যায় না, তখন তাকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়।" বৃটেনের সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

(৩) সুপরিবর্তনীয়– যে সংবিধান পরিবর্তন করতে বিশেষ কোন পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না বরং সাধারণ আইন প্রণয়ন করার প্রণালীতে আইন পরিষদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সংশোধন করা যায় তাকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। এ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল বা বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করার প্রয়োজন হয় না। যেমন– বৃটিশ সংবিধান।

(৪) দুস্পরিবর্তনীয়– যে সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না, বরং তা পরিবর্তন করতে হলে সংবিধানে বর্ণিত বিশেষ বা জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় তাকে দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয়। যেমন– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

১৯.২.২ লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য

লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য রয়েছে :

(১) লিখিত সংবিধান সুচিন্তিতভাবে গণ-পরিষদের মাধ্যমে রচনা করা হয়। কিন্তু অলিখিত সংবিধান রীতি-নীতি, আচার ও প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে।

(২) লিখিত সংবিধান দুস্পরিবর্তনীয় বা সুপরিবর্তনীয় হতে পারে। তবে সাধারণত দুস্পরিবর্তনীয়ই হয়। কিন্তু অলিখিত সংবিধান সুপরিবর্তনীয় হয়ে থাকে।

(৩) লিখিত সংবিধানে বিচার বিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু অলিখিত সংবিধানে আইন বিভাগের প্রাধান্য দেখা যায়।

(৪) লিখিত সংবিধানে শাসনতান্ত্রিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। কিন্তু অলিখিত সংবিধানে কোন পার্থক্য করা হয় না।

(৫) লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট ও নিশ্চিত। কিন্তু অলিখিত সংবিধান অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত।

তবে, একথা সত্য যে, বিশ্বের কোন রাষ্ট্রেরই সংবিধান পুরোপুরি লিখিত বা অলিখিত নয়। কাজেই এদের পার্থক্য মূলত গৌণ ও মাত্রাগত, শ্রেণিগত নয়।

১৯.২.৩ লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের গুণ ও দোষসমূহ

লিখিত সংবিধানের গুণ– লিখিত সংবিধানের কতকগুলো উল্লেখযোগ্য গুণ রয়েছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) লিখিত সংবিধান সুস্পষ্ট– লিখিত সংবিধানের ধারাগুলো সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়। ফলে সংবিধানের বিধি বিধান সম্পর্কে কারও কোনরূপ সন্দেহ থাকে না।

(২) লিখিত সংবিধান স্থিতিশীল– লিখিত সংবিধান স্পষ্ট ও দুস্পরিবর্তনীয় হওয়ায় একে সহজে পরিবর্তন করা যায় না। কাজেই এ সংবিধান স্থায়িত্ব লাভ করে।

(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য উপযোগী– যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন একই সাথে বলবৎ করা হয়। এ ব্যবস্থায় লিখিত সংবিধান সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক দিক নির্দেশনা দিয়ে সাহায্য করে।

লিখিত সংবিধানের দোষ– লিখিত সংবিধানের গুণের পাশাপাশির কিছু কিছু দোষও রয়েছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল :

(১) জাতীয় অগ্রগতির জন্য সহায়ক নয় - লিখিত সংবিধান সাধারণত অনমনীয় বা দুস্পরিবর্তনীয় হয়ে থাকে। জাতীয় চাহিদার পরিবর্তন ঘটলে সংবিধান পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু লিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলে অনেক ক্ষেত্রে অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

(২) বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে বেশি- সামাজিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না বলে পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব দেখা দেয়। ফলে রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়।

(৩) পরিপূর্ণতার অভাব- সংবিধানে সব কিছু লিখা সম্ভব নয়, সংগতও নয়। কাজেই লিখিত সংবিধানের অধিকাংশ লিখিত হলেও অপূর্ণতা থেকেই যায়।

অলিখিত সংবিধানের গুণ- অলিখিত সংবিধানের কতকগুলো উল্লেখযোগ্য গুণ আছে। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল

(১) সহজে পরিবর্তনশীল বলে সহায়ক– অলিখিত সংবিধান নমনীয় প্রকৃতির হয়ে থাকে। একে সহজে পরিবর্তন করা যায়। জাতীয় চাহিদার নিরিখে একে পরিবর্তন করা যায় বলে এটি জাতীয় অগ্রগতির জন্য উপযোগী ও সহায়ক।

(২) বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না- অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করে যেকোনো সমস্যার মোকাবিলা করা যায়, কাজেই কোন সমস্যাই প্রকট আকার ধারণ করতে পারে না। ফলে বিপ্লবের প্রয়োজন হয় না।

(৩) জাতীয় ঐতিহ্যের বাহন- দেশাচার, রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তিতে অলিখিত সংবিধান গড়ে উঠে। কাজেই একটি জাতির জাতীয় চেতনার বাহন হিসেবে অলিখিত সংবিধান বিরাজ করে।

অলিখিত সংবিধানের দোষ- অলিখিত সংবিধানের গুণের পাশাপাশি এর কতকগুলো উল্লেখযোগ্য দোষ রয়েছে। সে দোষগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল

(১) অস্পষ্টতা- অলিখিত সংবিধান রীতি-নীতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে বলে এটি অস্পষ্ট। শাসন ব্যবস্থার বিধিবিধানের জন্য সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা পেতে অসুবিধা হয়।

(২) স্থিতিশীলতার অভাব– অলিখিত সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে সরকার ও শাসন ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা থাকে না। সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে এরূপ সংবিধান শাসক গোষ্ঠির খেয়ালের বস্তুতে পরিণত হয়ে থাকে।

(৩) অনিশ্চিয়তা- অতি মাত্রায় নমনীয় হওয়ায় অলিখিত সংবিধান অনিশ্চয়তার দোষে আক্রান্ত। অধিক অনিশ্চয়তা হতাশার সৃষ্টি করে। ফলে বিপ্লবের সম্ভবনাকেও দূরে ঠেলে ফেলা যায় না।

১৯.২.৪ সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের মধ্যে পার্থক্য

(১) সুপরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত হতে পারে আবার নাও পারে, কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান লিখিত। এ কারণে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সাধারণত অস্পষ্ট ও ক্ষেত্রভেদে অস্থিতিশীল। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান স্পষ্ট এবং স্থিতিশীল।

(২) কোন কোন সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সাংবিধানিক ও সাধারণ আইন সমূহের মধ্যে পার্থক্য করা হয় না। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সাংবিধানিক আইন ও সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। সাংবিধানিক আইনকে দেশের সর্বোচ্চ আইন বলা হয় এবং সাধারণ আইনসমূহ এর অধীন।

(৩) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানকে সহজে সংশোধন করা যায়, কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে সংশোধন করা যায় না। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানকে সাধারণ আইন প্রণয়নের প্রণালীতে আইন পরিষদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান এভাবে পরিবর্তন করা যায় না। এর পরিবর্তন করতে জটিল ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

(৪) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকারের বিল সন্নিবেশিত করা হয়। কিন্তু কোন কোন সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার বিচার বিভাগের রায়ের ফল। যেমন– বৃটেনের জনগণের মৌলিক অধিকারের বিধান বিচার বিভাগের রায়ের ফলে গড়ে উঠেছে।

(৫) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণত সরকারের চূড়ান্ত কর্তৃত্বের আসন হচ্ছে আইনসভা। আইনসভার রচিত আইন আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। যেমন– ব্রিটিশ পার্লামেন্ট প্রণীত আইন। পক্ষান্তরে, দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট সরকার সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা বলার মালিক। আমেরিকার সুপ্রীম কোর্ট এরূপ ক্ষমতার অধিকারী।

(৬) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে সাধারণত ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয়। যেমন– আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সাংবিধানিক ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে, সুপরিবর্তনীয় সংবিধানে ক্ষমতার ব্যক্তিগত সম্মিলন ঘটতে পারে। যেমন– ব্রিটেনে মন্ত্রীদের নেতৃত্বে শাসন মূলক ও আইনমূলক ক্ষমতার সম্মিলন ঘটেছে।

১৯.২.৫ সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণ ও ত্রুটিসমূহ

(ক) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাবলি– সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাবলি নিম্নে আলোচনা করা হল:

(১) সহজে পরিবর্তন করা যায়– সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ হল এর পরিবর্তনশীলতা। একে সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে একে পরিবর্তন করা যায়। তাই এটা পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

(২) পরিবর্তনশীল ও উন্নয়নশীল সমাজে উপযোগী– প্রগতিশীল ও উন্নয়নশীল সমাজের জন্য এরূপ সংবিধান প্রয়োজনীয়। এরূপ সামাজে দ্রুত পরিবর্তন হয়। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে।

(৩) বিপ্লবের সম্ভাবনা কম– এতে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে না। সমাজের পরিবর্তন প্রয়োজন, অথচ মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তব রূপ দেওয়া যায় না, এমন পরিস্থিতিতে বিপ্লব হয়। কিন্তু সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় বলে বিপ্লব পরিহার করা সম্ভব হয়।

(৪) জরুরি অবস্থার উপযোগী– দেশের জরুরি অবস্থায় যা প্রয়োজন তা হলো সংবিধান সংশোধন করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। তা এরূপ সংবিধানে সম্ভব।

(৫) জনগণের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা– সুপরিবর্তনীয় সংবিধান সাধারণত অলিখিত হয় এবং এতে জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা বিচার বিভাগের রায়ের ফলস্বরূপ নিশ্চিত হয়। সুতরাং এতে জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকে। যেমন- যুক্তরাজ্যের সাংবিধানিক ব্যবস্থায় জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতার নিশ্চয়তা আছে।

(খ) সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের ত্রুটিসমূহ ঃ সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের ত্রুটিসমূহ অপরপৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হল:

(১) অস্পষ্ট ও অনিশ্চিত– সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান দোষ হল এর অনিশ্চয়তা। এটি স্থিতিশীল নয়। উন্নয়নমূলক কার্যাবলীর পক্ষে এ সংবিধান সহায়ক নয়। এতে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সম্ভবপর হয় না।

(২) স্থায়িত্বের অভাব– এই সংবিধান রাজনীতিবিদদের ক্রীড়ণকে পরিণত হতে পারে। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ইচ্ছামতো একে পরিবর্তন করে স্বীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে। এতে ব্যক্তিস্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকে না।

(৩) বিচার বিভাগের স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা– এ সংবিধান বিচার বিভাগকে স্বৈরাচারী হতে সাহায্য করে। ঘন ঘন পরিবর্তন করা যায় বলে এর মৌলিক ধারাগুলোরও অর্থের পরিবর্তন হয়। এরূপ ক্ষেত্রে বিচার বিভাগকে অর্থ নির্ধারণ করতে হয়। এ কারণে বিচার বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হতে পারে এবং স্বীয় ইচ্ছামতো সংবিধানের ধারাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারে।

(৪) প্রগতির পরিপন্থী– প্রগতির জন্য স্থায়িত্বের প্রয়োজন, যার অভাব এরূপ সংবিধানে লক্ষ্য করা যায়।

(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুপযোগী– এ সংবিধান যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের অনুপযোগী। কারণ যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্যতম শর্ত হল লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান, যা এ সংবিধান পূরণ করতে পারে না।

(৬) বেশি পরিমাণে স্বৈরাচারী হওয়ার সম্ভাবনা– এ সংবিধানের অধীনে সরকার বেশি পরিমাণে স্বৈরাচারী হতে পারে। কারণ এতে সরকারের বিভাগ ত্রয়ের ক্ষমতার সীমানা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকে না। বিশেষ করে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় এ সংবিধান স্বৈরাচার সৃষ্টিতে সহায়তা করতে পারে।

(গ) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাবলি ঃ এই সংবিধানের গুণাবলি নিচে দেওয়া হল:

(১) স্পষ্ট– দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান গুণ হল এর সুস্পষ্টতা। সাধারণত লিখিত হয় বলে দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান স্পষ্ট। সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলে এটি সরকারি কার্যাবলীর এবং জনগণের স্বাধীনতার বিধান করতে পারে।

(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের উপযোগী– যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জন্য এরূপ শাসন ব্যবস্থা অত্যন্ত উপযোগী। এর ধারাগুলো স্পষ্ট এবং একে সহজে পরিবর্তন করা যায় না বলে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গ রাষ্ট্রসমূহের ক্ষমতা আত্মসাৎ করতে পারে না। যুক্তরাষ্ট্র সংবিধানের সৃষ্টি। সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয় হলে যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামো মজবুত থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাষ্ট্রীয় সরকারের টানাপোড়েনের মুখে তা ভেঙ্গে পড়ে না।

(৩) উন্নয়নশীল সমাজের উপযোগী– এটা উন্নয়নশীল সমাজের জন্য অধিকতর উপযোগী। এই সংবিধানের অধীনে দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে সমাজের উন্নতি সম্ভব হয়। উন্নয়নশীল সমাজে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রয়োজন। দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ধারাগুলো দীর্ঘদিন ধরে বলবৎ থাকে। ফলে এটা সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা দান করে।

(৪) মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা– এরূপ সংবিধানে মৌলিক অধিকারের বিল সংযোজিত থাকে এবং মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের ব্যবস্থা থাকে।

(৫) সাংবিধানিক ধারাসমূহ যথাযথভাবে পালন– এ সংবিধানের ধারাগুলো যথাযথভাবে অনুশীলন করা যায়। কারণ সংবিধানের কোন ধারা ভঙ্গ করা হলে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত তার প্রতিকার করে।

(৬) শাসক ও শাসিতের সুসম্পর্ক– এ সংবিধান অনুসারে শাসকগণ তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে এবং শাসিতগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সুনিশ্চিত থাকে। ফলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় থাকে।

(৭) আন্তঃবিভাগীয় হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা কম– এতে প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। সুতরাং এ সংবিধানের অধীনে এক বিভাগ কর্তৃক অন্য বিভাগের উপর হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

(ঘ) দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ত্রুটিসমূহ– দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের ত্রুটিসমূহ অপরপৃষ্টায় বর্ণনা করা হল:

(১) স্থিতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার অভাব– দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানের প্রধান ত্রুটি হল এর স্থিতিস্থাপকতা ও পরিবর্তনশীলতার অভাব। অর্থাৎ এটা পরিবর্তনশীল সময় এবং প্রগতিশীল সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারেনা।

(২) বিপ্লবকে আমন্ত্রণ জানায়– এতে বিপ্লবের সম্ভাবনা থাকে বেশি। জনসাধারণ পরিবর্তনের জন্য অধীর হয়ে ওঠে, তখনও সাংবিধানিক পরিবর্তন সম্ভবপর হয় না। এর ফলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠে। মেক্‌লে বলেছেন, "বিপ্লবের কারণ হল জাতি অগ্রসর হতে থাকে অথচ সংবিধান অনড় অবস্থায় থাকে।"

(৩) বিচার বিভাগের মর্জির উপর নির্ভরশীলতা– দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান সহজে পরিবর্তন করা যায় না। একে পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াবার জন্য বিচার বিভাগীয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। আমেরিকার সংবিধান বিকাশের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে। সুতরাং এই সংবিধানের সঠিক প্রয়োগ বিচার বিভাগের মর্জির উপর নির্ভর করে।

(৪) উন্নত সমাজের অনুপযোগী– উন্নত সমাজে জনগণের রাজনৈতিক চেতনার স্তরও অত্যন্ত উন্নত মানের। এরূপ সমাজে জনগণের কিছু কিছু সাংবিধানিক অধিকার প্রথাভিত্তিক। এরূপ সমাজে সকল সাংবিধানিক ধারা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এরূপ সমাজের জন্য দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান অনুপযোগী।

সার-সংক্ষেপ

সংবিধান দু'ধরনের – লিখিত ও অলিখিত। লিখিত সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিমালা সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকে আর অলিখিত সংবিধান রাষ্ট্রের প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে। এ দু'টি ভাগ ছাড়াও সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সংবিধানকে আরও দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা– সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। লিখিত সংবিধান কাকে বলে?
ক. যে সংবিধান লিখিত থাকে
খ. যে সংবিধান প্রথার উপর গড়ে উঠে
গ. যে সংবিধান আংশিক লিখিত থাকে
ঘ. যে সংবিধান অধিকাংশ লিখিত ও কিছু অলিখিত থাকে

২। সুপরিবর্তনীয় সংবিধান কাকে বলে?
ক. যে সংবিধান মন্ত্রীরা পরিবর্তন করতে পারে
খ. যে সংবিধান সহজ নিয়মে পরিবর্তন করা যায়
গ. যে সংবিধান মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা যায়
ঘ. যে সংবিধান নিয়মিত পরিবর্তন করা হয়

৩। কোন দেশের সংবিধান অলিখিত?
ক. বাংলাদেশ খ. ভারত।
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ. বৃটেন।

পাঠ ৩ : সাংবিধানিক সরকার, উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য, সংবিধান ও গণতন্ত্র, বাংলাদেশ সংবিধানের সমস্যা ও প্রকৃতি

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- সাংবিধানিক সরকার কি তা উল্লেখ করতে পারবেন।
- উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- সংবিধান ও গণতন্ত্র সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- গণতন্ত্র এবং বাংলাদেশ সংবিধানের সমস্যা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৯.৩.১ সাংবিধানিক সরকার

প্রাচীনকালের গ্রীক নগররাষ্ট্র থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সাংবিধানিক সরকারের বিকাশের ধারা অব্যাহত গতিতে চলে আসছে। সাংবিধানিক সরকারের বিকাশ ধারায় ইংল্যান্ডের রাজার ক্ষমতার উপর বাধানিষেধ আরোপ এবং জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা একটি স্মরণীয় ব্যাপার। আর সেই পথ ধরে আমেরিকা ও ফরাসী দেশে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমেরিকার সংবিধানে "নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি" সরকারি কর্মচারীদের স্বেচ্ছাচারিতার উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেছে। ১৭৮৯ সনের পর ফরাসী পঞ্চম প্রজাতন্ত্রের মাধ্যমে ফ্রান্সে সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত হানে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাংবিধানিক শাসনব্যবস্থা আবার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সাংবিধানিক সরকারের সংজ্ঞা

সাংবিধানিক সরকার বলতে সেই সরকারকে বুঝায় যা সংবিধানের নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হয়। নিম্নে সাংবিধানিক সরকারের কয়েকটি সংজ্ঞা দেয়া হল। কার্ল ফ্রেডারিক-এর মতে, "ক্ষমতার বিভক্তি যেকোনো সুসভ্য সমাজের মূল ভিত্তি, আর এটাই হচ্ছে সাংবিধানিক সরকারের মূল কথা।" প্রেসিডেন্ট উইলসন-এর ভাষায়, "নিয়মতান্ত্রিক সরকার হল এমন এক সরকার, যার ক্ষমতা জনস্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা সংরক্ষণে নিয়োজিত।"

সাধারণভাবে সাংবিধানিক সরকার বলতে সমাজের কর্তৃত্বের অধিকারী শাসকগণের ক্ষমতার উপর বাধা-নিষেধ আরোপের ব্যবস্থাকেই বুঝায়। সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিভিন্ন বিভাগ ও বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তির মাঝে এমনভাবে ন্যস্ত হবে, যাতে প্রতিটি বিভাগ বা পদ একে অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় ও পরস্পরের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত হয়। সাংবিধানিক সরকারকে সীমাবদ্ধ সরকার বা নিয়মতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হিসেবেও গণ্য করা হয়। বস্তুত সরকারের ক্ষমতায় বাধা-নিষেধ আরোপের উপরই সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠিত।

১৯.৩.২ উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

১। **সুস্পষ্টতা**– উত্তম সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্টতা। সুস্পষ্টতা হলো বক্তব্যের নির্দিষ্টতা, ভাষার সহজতা এবং ব্যাখ্যার প্রাঞ্জলতা। সংবিধানের ভাষা এমন হওয়া উচিত নয়, যার দুই বা ততোধিক অর্থ করা সম্ভব। সংবিধানের বিষয়বস্তুর অর্থ নিয়ে যাতে বিতর্কের অবকাশ না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২। **ব্যাপকতা**– ব্যাপকতার অর্থ এই নয় যে, সংবিধান বৃহদায়তন হবে। ব্যাপকতা বলতে সংবিধানে শাসন সম্পর্কিত মৌল বিষয়গুলোর সংক্ষিপ্ত নির্দেশ থাকবে। সরকারের সংগঠন ও ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য যা দরকার তার রূপরেখা সংবিধানে থাকবে কোন কিছুর ব্যাপক বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

৩। সংক্ষিপ্ততা– সংক্ষিপ্ততা উত্তম সংবিধানের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সংবিধানে বিভিন্ন ধারা ও উপধারার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ থাকবে। সংবিধান ব্যাপকতর হলে বিতর্কের ও বিভ্রান্তির সম্ভাবনা দেখা দেয়।

৪। নমনীয়তা ও দুষ্পরিবর্তনীয়তা– সংবিধান সংশোধনের পদ্ধতি সহজ হতে হবে। সংবিধান যদি দুষ্পরিবর্তনীয় হয়, তাহলে তাকে প্রয়োজনে পরিবর্তন করে সময়োপযোগী করা কঠিন হয়। আবার অতি নমনীয় হলে সংবিধানের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব সহজে বিপন্ন হতে পারে। তাই সংবিধান নমনীয়তা ও অনমনীয়তার মধ্যপন্থা অবলম্বন করে রচিত হওয়া উচিত।

৫। লিখিত সংবিধান– উত্তম সংবিধান লিখিত হওয়া উচিত। অলিখিত সংবিধানে অনেক সময় ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জটিলতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু লিখিত সংবিধানে সেরূপ সম্ভাবনা খুব কম থাকে।

৬। মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তি– মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্তি উত্তম সংবিধানের অন্যমত বৈশিষ্ট্য। মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হলে নাগরিকররা তার প্রতিকার করতে পারে।

৭। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি– উত্তম সংবিধানে একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। দীর্ঘ দিন ধরে একটি জাতি যে স্বকীয়তা ও মৌলিকত্ব লালন করে থাকে তাই সংবিধানে ফুটে ওঠে।

৮। ভারসাম্য রক্ষা– আইনগত সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রে উত্তম সংবিধান বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সরকার ও জনগণের মধ্যে ভারসাম্য বিধান করা উত্তম সংবিধানের একটি বৈশিষ্ট্য।

উপসংহারে বলা যায় যে, সংবিধান তৈরির প্রেক্ষাপট যাই হোক না কেন, রাষ্ট্রের জনসাধারণের অধিকতর কল্যান সাধন, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাওয়া-পাওয়ার সন্ধান যে সংবিধানে পাওয়া যায়, তাকে সেই রাষ্ট্রের জন্য উত্তম সংবিধান বলে অভিহিত করা যায়।

১৯.৩.৩ সংবিধান ও গণতন্ত্র

সংবিধান তৈরির লক্ষ্য সীমিত ক্ষমতায় সরকার প্রতিষ্ঠা করা। সাংবিধানিক সরকার ছাড়া কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সঠিক পথে পরিচালিত হতে পারে না। নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অন্যতম পথই হচ্ছে সংবিধান। তবে একথা ঠিক যে, সব সময় সংবিধান থাকলেই যে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সংবিধান শাসকের খেয়াল খুশি ও স্বেচ্ছাচারিতায় রূপান্তরিত হয়।

তবে সাংবিধানিক সরকার যদি সঠিক পথে পরিচালিত হয়, নাগরিক অধিকারের ধারণার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকে, তাহলে গণতন্ত্র নিশ্চিত হয়। গণতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্ব যা সংবিধানের দ্বারা সীমিত শাসনের মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। সংবিধান ব্যক্তির খেয়ালের সামগ্রী না হয়ে নাগরিক অধিকারের অভিভাবক হলে তা গণতন্ত্রের সমার্থক হয়ে ওঠে। উত্তম সংবিধান ও গণতন্ত্র একই সমান্তরালে অবস্থান করে। একমাত্র উত্তম সংবিধানই পারে গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে। তাই গণতন্ত্র ও উত্তম সংবিধানের মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ফ্রান্সে কোন সনের পর সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করেছে ?

ক. ১৭৮৯ খ. ১৮৮৯
গ. ১৯২৫ ঘ. ১৭২৫

২। সাংবিধানিক সরকার কোন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ?

ক. রাষ্ট্রের ক্ষমতায় বাধা নিষেধ খ. সমাজের ক্ষমতায় বাধা নিষেধ
গ. সরকারের ক্ষমতায় বাধা নিষেধ ঘ. জনগণের ক্ষমতায় বাধা নিষেধ

৩। নিচের কোন গুণটি উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ?
ক. অপরিবর্তনীয় খ. সুপরিবর্তনীয়
গ. সংক্ষিপ্ত ঘ. বৃহৎ

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। সংবিধান কাকে বলে। –১৯.১.১
২। সংবিধান প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি কয়টি ও কি কি? –১৯.১.৩
৩। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের পার্থক্য নির্দেশ করুন। –১৯.২.২
৪। সুপরিবর্তনীয় সংবিধানের গুণাবলি আলোচনা করুন। –১৯.২.৫(ক)
৫। সাংবিধানিক সরকার কাকে বলে ? –১৯.৩.১
৬। সংবিধান ও গণতন্ত্রের সম্পর্ক উল্লেখ করুন ? –১৯.৩.৩

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সংবিধান কি ? উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি ? –১৯.১.১ ও ১৯.৩.২
২। সংবিধানের শ্রেণি বিভাগ করুন। লিখিত ও অলিখিত সংবিধানের গুণ ও দোষগুলো আলোচনা করুন। ১৯.২.১ এবং১৯.২.৩
৩। সংবিধানের উৎসগুলো আলোচনা করুন। –১৯.১.২
৪। সংবিধান কাকে বলে? সুপরিবর্তনীয় এবং দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধানের দোষ ও গুণ আলোচনা করুন। – ১৯.১.১ ও ১৯.২.৫
৫। উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন। –১৯.৩.২

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ঘ, ২। ঘ, ৩। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। ক, ২। খ, ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ক, ২। গ, ৩। গ